ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২৫

কর্তৃত্ববাদ পতন-পরবর্তী বাংলাদেশের গণমাধ্যম পরিস্থিতি

জাফর সাদিক

ডেপুটি কোঅর্ডিনেটর, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

০৯ ডিসেম্বর ২০২৫

কর্তৃত্ববাদের পতন-পরবর্তী বাংলাদেশের গণমাধ্যম পরিস্থিতি

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার প্রবল আন্দোলনের মুখে কর্তৃত্ববাদী আওয়ামীলীগ সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে একটি অবাধ ও উন্মুক্ত গণমাধ্যম প্রত্যাশিত ছিলো। বিশেষ করে, দীর্ঘদিনের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য প্রবল চাপ, রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব, সেল্ফ সেন্সরশিপ, মিডিয়া ক্যাপচারের মতো নানা নেতিবাচক ধারা পরিবর্তন হওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিলো। গণমাধ্যমকে স্বাধীন, শক্তিশালী ও বস্তুনিষ্ঠ করতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে ২০২৪ সালের ১৮ নভেম্বর গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছিলো, যার প্রতিবেদন ২০২৫ সালের ২২ মার্চ প্রধান উপদেষ্টার কাছে হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু কর্তৃত্ববাদের পতনের দীর্ঘ ১৬ মাস এবং কমিশনের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার প্রায় ৯ মাস পেরিয়ে গেলেও বাংলাদেশের গণমাধ্যম নেতিবাচক পরিস্থিতি কতটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে, তার একটি পর্যালোচনা অত্যন্ত জরুরি।

বাংলাদেশের গণমাধ্যমঃ অভ্যুত্থান পূর্ববর্তী অবস্থা ও বাস্তবতা

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর গণমাধ্যমের জন্য তুলনামূলক মুক্ত পরিবেশের সময়কালটা ছিলো খুবই স্বল্প। ১৯৭৩ সালে দি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স (ডিক্লেয়ারেশন অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন) আইন পাস হয়। ১৯৭৪ সালে নিউজ পেপার এমপ্লয়ীজ (কন্ডিশন অব সার্ভিস) আইন পাস হয়। আর ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রেস কাউন্সিল আইন পাস হয়। তবে ১৯৭৩ সালে প্রেস ও প্রকাশনা আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে গণমাধ্যমকে একটি কাঠামোগত পদ্ধতির আওতার আনার প্রয়াস মুখ থুবড়ে পরে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে সংবাদপত্র ঘোষণা (সংশোধন) অধ্যাদেশের মধ্য দিয়ে; যার অধীনে ২৯টি দৈনিক এবং ১৩৮টি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ও সাময়িকীর প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হয়।[১] সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে কেবল দুটি ইংরেজী ও দুটি বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকীর অনুমতি দেওয়া হয়। এছাড়াও স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট ১৯৭৪, কপিরাইট অ্যাক্ট, কনটেম্পট অফ কোর্ট অ্যাক্ট, চিলড্রেন অ্যাক্ট প্রভৃতি আইন বাংলাদেশের সংবাদপত্রকে কোন না কোনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।[২]

১৯৭৫ এর শেষভাগে এসে সংবাদপত্র ঘোষণা (সংশোধন) অধ্যাদেশ বাতিল করা হলে আবার অনেক সংবাদপত্র নতুন করে যাত্রা শুরু করে। এরপর নানা ঘটনাপ্রবাহের পরিক্রমায় প্রেস ইন্সটিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) প্রতিষ্ঠা, প্রেস কাউন্সিল গঠন, জাতীয় প্রেস ক্লাবের জন্য জমি প্রদানসহ নানা ইতিবাচক পদক্ষেপ স্বত্ত্বেও সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নীতিমালায় হস্তক্ষেপ অব্যাহত থাকে। সংবাদপত্র বন্ধসহ বিভিন্ন সময় সাংবাদিকদের আটক ও কারাদণ্ডের চর্চাও অব্যাহত থাকে। ১৯৮২ সালে সামরিক শাসনের চূড়ান্ত সময়ে 'প্রেস অ্যাডভাইস' নামক রাষ্ট্রীয় নীতি গণমাধ্যমে অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠে। এসময় সম্পাদকদের নানা চাপ, রাষ্ট্রীয় অভিপ্রায়ে সংবাদ প্রকাশের নির্দেশ, সাংবাদিকদের দেশত্যাগে বাধ্য করা, আটক করা, সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়াসহ বিদেশী সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন নিষিদ্ধ করার মতো ঘটনা ঘটতে থাকে।[৩] সরকারের সমালোচনামূলক খবর ছাপানোর অভিযোগে এ সময় প্রায় ৫০টি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়।[৪]

১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করলে বিদেশী সম্প্রচার গণমাধ্যমের জন্য আকাশ উন্মুক্ত করে দেওয়া, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন গণমাধ্যমে বিরোধী দলের সংবাদ প্রচারের স্বাধীনতাসহ সীমিত পরিসরে নানা ইতিবাচক পরিবর্তনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রিডম হাউজ বাংলাদেশকে 'মুক্ত গণতন্ত্রের' দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।[৫] এই সময় বাংলাদেশে রেকর্ড সংখ্যক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মোট পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ছিল ৬৬৯টি কিন্তু পরের বছর তা বৃদ্ধি পেয়ে ৯৪০ এ উন্নীত হয়।[৬] তবে তখনও বেসরকারী সম্প্রচারখাতের অনুমতি প্রদান না করায় বাংলাদেশী মালিকানাধীন কোনো বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল গড়ে উঠে নি। ১৯৯৬ এর পর থেকে এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই, একুশে টিভি, প্রথম আলোসহ বেশ কয়েকটি নতুন সংবাদপত্র ও বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল যাত্রা শুরু করে। তবে এসময় দৈনিক বাংলা, টাইমস, বিচিত্রা ও আনন্দ বিচিত্রাসহ বেশ কিছু সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর ২০০১ সালের পর একুশে টিভির লাইসেন্স বাতিল করে সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২০০৬ সালের পর দেশের প্রথম সংবাদভিত্তিক টিভি চ্যানেল সিএসবির সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়।

---

[১] গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন প্রতিবেদন, ২০২৫

[২] https://www.jnu.ac.bd/journal/assets/pdf/1_1_79.pdf | আহমেদ, হেলাল উদ্দিন ও রহমান, গোলাম। (২০০৮)। সংবাদপত্র ও সাময়িকী। বাংলা পিডিয়া

[৩] প্রাগুক্ত: ১

[৪] প্রাগুক্ত ২

[৫] প্রাগুক্ত: ১

[৬] প্রাগুক্ত ২

তবে ২০০৯ সালের পর হঠাৎ করে বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল ও সংবাদপত্রের অনুমোদনে উল্লম্ফন ঘটে। এসময় শতাধিক পত্রিকা ও টেলিভিশন অনুমোদন পায়। ২০০৯ থেকে ২০১৮ সালেই ৩৬টি গণমাধ্যমের অনুমোদন দেওয়া হয়। এর মধ্যে ২৮টি টেলিভিশন চ্যানেল অনুমোদন পায়, যেখানে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত তিনটি এবং ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত মাত্র ১০টি টেলিভিশনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিলো।[৭] এ সময় অধিকাংশ গণমাধ্যমের মালিকানায় ছিলো বিভিন্ন ব্যবসায়িক কিংবা রাজনৈতিক গোষ্ঠী। সরকারঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী কিংবা সরকারী দলের রাজনৈতিক-সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছিলো। এ সময়কালে বিদ্যমান গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে ৪৮টির মালিক ৩২টি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী।[৮] রাজনৈতিক বিবেচনায় অনেক গণমাধ্যমের নিবন্ধন দেওয়ায় গণমাধ্যমের মালিকানায় রাজনৈতিক ও কর্পোরেট স্বার্থের মিশ্রণ ছিল, স্বচ্ছতা ও আর্থিক নিরাপত্তার ঝুঁকি বিদ্যমান ছিলো। এছাড়া সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ, সেল্ফ সেন্সরশিপ, কর্পোরেট স্বার্থের সুরক্ষা- ইত্যাদি কারণে গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় ব্যাপক ঝুঁকি ছিলো।[৯]

তবে গণমাধ্যমের এই সংখ্যাধিক্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মানের উন্নতি নির্দেশ করা যায় না। কারণ এ সময় দিগন্ত, চ্যানেল ওয়ান ও ইসলামিক টেলিভিশন এবং আমার দেশ, দিনকালসহ বেশ কিছু গণমাধ্যমের সম্প্রচার ও প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও সাইবার সিকিউরিটি আইনের মাধ্যমে গণমাধ্যমের উপর চাপ তৈরি করা হয়। অসংখ্য সাংবাদিক নির্যাতন, নীপিড়ন, হামলা, মামলা ও হয়রানির শিকার হন। বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরে ৬১ জনকে সাংবাদিককে হত্যা করা হয়। একই সময়ে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন ৩ হাজার ৫৮৮ সাংবাদিক।[১০] এ সময়কালে সরকারবিরোধী কিংবা নানা ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক বিরোধের জেরে অনেক গণমাধ্যমকর্মীকে চাকরি হারাতে হয়, দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়। অনেকে আবার গুমের শিকারও হন। এমনকি আইন-শৃঙ্খলাবাহিনীর হেফাজতে থাকা অবস্থায় মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে।

মোটকথা, ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে, সকল সরকারই গণমাধ্যমকে যোগাযোগের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত কর্তৃত্ববাদী আওয়ামীলীগ সরকারও এর ব্যতিক্রম ছিল না। নানা ধরণের সেন্সরশিপ, হয়রানি, সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার চাপ, বিচার বিভাগীয় হয়রানি, একের পর এক কঠোর আইন, পুলিশি সহিংসতা এবং ক্ষমতাসীন দলের পেশীশক্তির চাপ দিয়ে সরকার স্বাধীন সাংবাদিকতার সুযোগ বাধাগ্রস্ত করেছে। এই পরিস্থিতির কারণে, নিউজরুমগুলি সাবধানতার সাথে সরকারকে চ্যালেঞ্জ করা এড়িয়ে সেলফ সেন্সরশিপের আশ্রয় নেয়।[১১] যার প্রভাব দেখা যায় রিপোর্টার্স উইদআউট বর্ডারের বিশ্ব সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকেও। ২০০৯ সালে ১২১ অবস্থান থেকে বাংলাদেশের ক্রমাবনতি হয়ে ২০২৪ সালে তালিকার ১৬৫-তে নেমে আসে।[১২]

কর্তৃত্ববাদের পতন পরবর্তী গণমাধ্যম পরিস্থিতি

কতৃত্ববাদের পতন পরবর্তী সময়ে আশা করা হয়েছিলো, গণমাধ্যমের জন্য একধরণের উন্মুক্ত পরিবেশ ও অবাধ সাংবাদিকতার পথ উন্মুক্ত হবে। পূর্বতন নেতিবাচক চর্চার ধারাবাহিকতা বন্ধ হবে, কিংবা হ্রাস পাবে। কিন্তু বিগত ১৬ মাসের বাস্তবতা ভিন্ন কথা বলছে। বিশ্ব সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে বাংলাদেশ ১৬ ধাপ এগিয়ে ১৪৯ তম হলে, এতে খুব বেশি আশাবাদী হওয়ার সুযোগ নেই। কারণ, এখনো গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং পূর্বে বিরাজমান নেতিবাচক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ করা যায় নি, এমনকি কিছু সম্ভাবনা দেখা গেলেও তা নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

মালিকানায় রাজনীতি সংশ্লিষ্টতা, সম্পাদকীয় নিয়ন্ত্রণ ও মিডিয়া রূপান্তর: ২০২৪ এর ৫ আগস্টের পর পূর্বের ধারাতেই গণমাধ্যমের ব্যবস্থাপনা পর্ষদসহ, উচ্চ পদধারী সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের রাতারাতি বদল ঘটে যায়। বিদ্যমান বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় এই বদল হয় বলে জানা যায়। এসময় কমপক্ষে আটটি সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং ১১টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের বার্তা প্রধানকে বরখাস্ত করা হয়েছে বা 'পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে'। আবার কেউ কেউ সরকার পরিবর্তনের পরপরই নিজ থেকেই চাকরি থেকে সরে গেছেন। বিভিন্ন গণমাধ্যমের নির্বাহী সম্পাদক, প্রধান বার্তা সম্পাদক এবং বার্তা সম্পাদকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতেও পরিবর্তন এসেছে।[১৩] গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে দেখা যায়, এসময় অন্তত ২৯টি গণমাধ্যমের শীর্ষ পদগুলোতে বিভিন্ন রদ-বদল এবং একটি অনলাইন পোর্টালের

---

[৭] https://www.prothomalo.com/bangladesh/lmgpyvejgq

[৮] Riaz, Ali and Rahman, Mohammad Sajjadur, Who Owns the Media in Bangladesh? Center for Governance Studies, 2021

[৯] https://samsn.ifj.org/SAPFR24-25/bangladesh/

[১০] https://www.prothomalo.com/bangladesh/8oatcxsuoq

[১১] https://rsf.org/en/country/bangladesh

[১২] https://rsf.org/en/index

[১৩] https://mzamin.com/news.php?news=148855

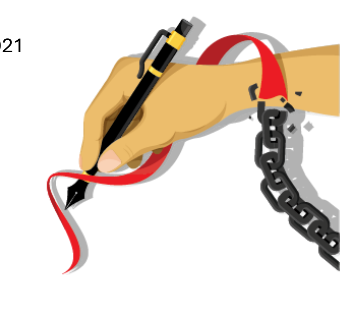

মালিকানায় বদল এসেছে।[১৪] [১৫] অনেকক্ষেত্রেই এই পরিবর্তনগুলি সবসময় স্বচ্ছভাবে হয় নি। এই পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে অনেক ক্ষেত্রেই মালিকপক্ষ বা নতুন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে চেষ্টা করছে।[১৬] উদাহরণসরূপ, ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের মালিকানাধীন বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান, দৈনিক জনকণ্ঠ, একাত্তর, ডিবিসি ও সময় টেলিভিশনের ব্যবস্থাপনা পর্ষদ, সম্পাদক, প্রধান বার্তা সম্পাদক, প্রধান প্রতিবেদকসহ বিভিন্ন পদে কর্মরত আগের সাংবাদিক ও কর্মকর্তাদের সরিয়ে দলীয় রাজনীতির প্রভাব-সংশ্লিষ্ঠ অনেক সংবাদকর্মী ও ব্যক্তি যুক্ত হন।

পুরনো ধারায় গণমাধ্যমের নিবন্ধন: কর্তৃত্ববাদী শাসনকালে সরকারি দলের নেতা এবং তাদের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী, রাজনীতিক ও সাংবাদিকদেরকেই গণমাধ্যমের নিবন্ধন দেওয়া হয়। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন পুরনো এ ধারার বদলে বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশনের মাধ্যমে সকল প্রকার নিবন্ধন ও যাচাইয়ের কার্যক্রম পরিচালনার সুপারিশ করে। কিন্তু এ বছরের মাঝামাঝি পুরনো ধারাতেই নেক্সট টিভি এবং লাইভ টিভি নামে আরো দুটি নতুন টেলিভিশন চ্যানেল অনুমোদন দিয়েছে তথ্য মন্ত্রণালয়। টিভি দুটির লাইসেন্স গ্রহণে গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের একাংশকে নিয়ে গঠিত জাতীয় নাগরিক কমিটির দুইজন নেতার সংশ্লিষ্টতার কথা জানা গেছে- যাদের মধ্যে একজন আবার পরবর্তীতে গঠিত নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টিরও নেতা।[১৭] এছাড়া বন্ধ করে দেওয়া চ্যানেলগুলোর মধ্যে চ্যানেল ওয়ান আবার কার্যক্রম শুরু করেছে, দিগন্ত টিভি কার্যক্রম শুরুর প্রক্রিয়ায় আছে। আমার দেশ পুনরায় প্রকাশিত হচ্ছে। এর বাইরে স্টার টিভি (পূর্বে সাম্পান টিভি নামে নিবন্ধনপ্রাপ্ত) নামে আরেকটি টেলিভিশন সম্প্রচারের অপেক্ষায় আছে। মাঝে গ্রিন টেলিভিশন বন্ধ হয়ে গেলেও গত অক্টোবর থেকে পুনরায় সম্প্রচারে এসেছে।

সব মিলিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশে ৩২৭০টি সংবাদপত্র ও সাময়িকী রয়েছে; এর মধ্যে ঢাকায় ১৩৭১টি এবং ঢাকার বাইরে ১৮৯৮টি। বেসরকারী টেলিভিশন রয়েছে ৫০টি, যার মধ্যে সম্প্রচারে রয়েছে ৩৪টি। অর্থাৎ বিটিভিসহ সরকারি- বেসরকারি টেলিভিশন রয়েছে ৫০টিরও বেশি। নিবন্ধিত অনলাইন নিউজপোর্টাল রয়েছে ৪০৬টি; এর মধ্যে ২১৩টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল আর ১৯৬টি পত্রিকার অনলাইন পোর্টাল। এর বাইরে ২৮টি অনুমোদিত এফএম চ্যানেল থাকলেও সম্প্রচার কার্যক্রম চালাচ্ছে ১৯টি বেসরকারি রেডিও।[১৮]

সাংবাদিক নিপীড়ন, হয়রানি ও হেনস্থা: কর্তৃত্ববাদী শাসনে নানা নিবর্তনমূলক আইন, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা এবং সরকারি বিভিন্ন বাহিনীর মাধ্যমে অসংখ্য সাংবাদিক গুম, খুন, হেনস্থা, হয়রানি, মামলা কিংবা শারিরীক আঘাতের শিকার হয়েছে। কর্তৃত্ববাদের পতনের পরও এই ধারা থেমে যায় নি। যদিও হয়রানির শিকার সাংবাদিকদের একটি অংশ কর্তৃত্ববাদী শাসনের পক্ষভুক্ত কিংবা সুবিধাভোগী হিসেবে হেনস্থার শিকার হয়েছেন। কিন্তু গণমাধ্যমকর্মীদের উপর এ ধরণের হামলা-মামলা স্বাধীন ও মুক্ত গণমাধ্যম ধারণার পরিপন্থী। বিশেষ করে, অপরাধের ধরণ ও মাত্রা বিবেচনায় না নিয়ে যথেচ্ছ মামলা, হামলা কিংবা হুমকি এই পরিস্থিতি আরো নেতিবাচক করে তুলেছে।

বাংলাদেশে গণমাধ্যমকর্মীদের উপর হামলা, মামলা, নির্যাতনের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া প্রায় দুরূহ হলেও, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে আংশিক ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের জরিপেও কিছু চিত্র উঠে আসে।

টিআইবিকর্তৃক গণমাধ্যমসূত্রে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে ২০২৫ এর ১ নভেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে কমবেশি ৪৭৬টি ঘটনায় অন্তত ১০৭৩ জন গণমাধ্যমকর্মী হামলা, মামলা, হত্যা, হুমকি, হয়রানি, কারান্তরীন, পরিবারের সদস্যদের ওপর হামলা, বাসা বা সম্পত্তি নষ্ট করাসহ চাকুরিচ্যুতি, চাকরি থেকে অব্যাহতি কিংবা বরখাস্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ২৫৯টি ঘটনায় ৪৫৯ জন গণমাধ্যমকর্মী হামলার শিকার হয়েছেন। ৮৯টি ঘটনায় ৯৯ জনকে নানা হুমকি দেওয়া হয়েছে। ৩০টি ঘটনায় ৭০ জনকে হয়রানি করা হয়েছে। ১৯টি ঘটনায় অন্তত ২৭ জনকে আটক করা হয়েছে। ০৯ টি ঘটনায় ১৭ জন পরিবারের সদস্য হামলার অথবা বাড়িঘর ধ্বংসের শিকার হয়েছেন। ৬ জনকে হত্যা করা হয়েছে, ৫টি ঘটনায় ১৮৯ জন সাংবাদিককে চাকুরিচ্যুত, দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি কিংবা বরখাস্ত করা হয়েছে।[১৯]

---

[১৪] https://bangla.deshkalnews.com/mass-media/17731

[১৫] https://bdtoday.net/national/19636

[১৬] https://samsn.ifj.org/SAPFR24-25/bangladesh/

[১৭] https://www.prothomalo.com/bangladesh/lmgpyvejgq

[১৮] প্রাগুক্ত: ১

[১৯] টিআইবিকর্তৃক গণমাধ্যম সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ (২০২৪-২০২৫)

এই সকল ঘটনার বিভাগভিত্তিক হিসাবে দেখা যায় যে, ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি ৩৫ শতাংশ, চট্টগ্রামে ১৪ শতাংশ, খুলনায় ১১ শতাংশ, রংপুর ও রাজশাহীতে ১০ শতাংশ করে, বরিশালে ৯ শতাংশ, ময়মনসিংহে ৬ শতাংশ এবং সিলেটে সবচেয়ে কম ৫ শতাংশ সাংবাদিক নিপীড়ন, হামলা, মামলা, হয়রানি, নির্যাতন, খুন কিংবা অন্যান্য ঘটনা ঘটেছে।

অন্য আরেকটি বেসরকারি সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর মিডিয়া মনিটরিং প্রতিবেদনেও টিআইবির কাছাকাছি ফল দেখা যায়। আসকের তথ্য বলছে, ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ এর অক্টোবর পর্যন্ত ৫২৩টি সাংবাদিক নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবরের মধ্যে রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের দ্বারা (বিএনপি, আওয়ামীলীগ, জাতীয় পার্টি, এনসিপি, বৈছাআ) ২৭টি, পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ১০৯টি, সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে ৪১টি, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর মাধ্যমে ২০টি নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া ৪ জন সাংবাদিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে এবং ১৫টি মৃত্যু-হুমকির ঘটনা ঘটেছে। আর সংবাদ প্রকাশের জেরে ৭১টি এবং বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকেন্দ্রিক ৫২টি মামলা করা হয়েছে।[২০]

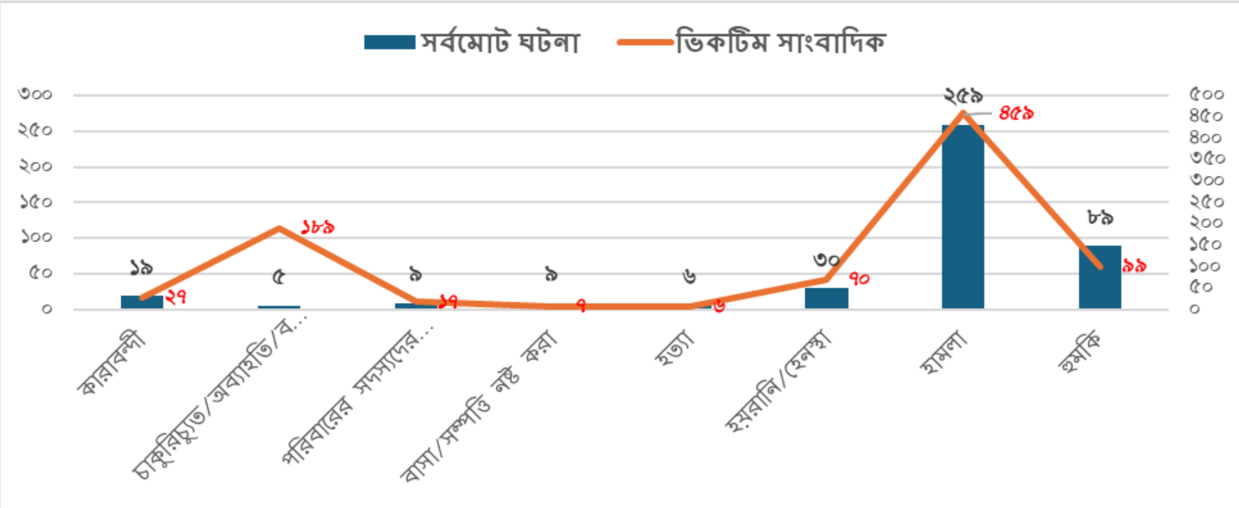

সূত্র: টিআইবিকর্তৃক গণমাধ্যম সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ (২০২৪-২০২৫)

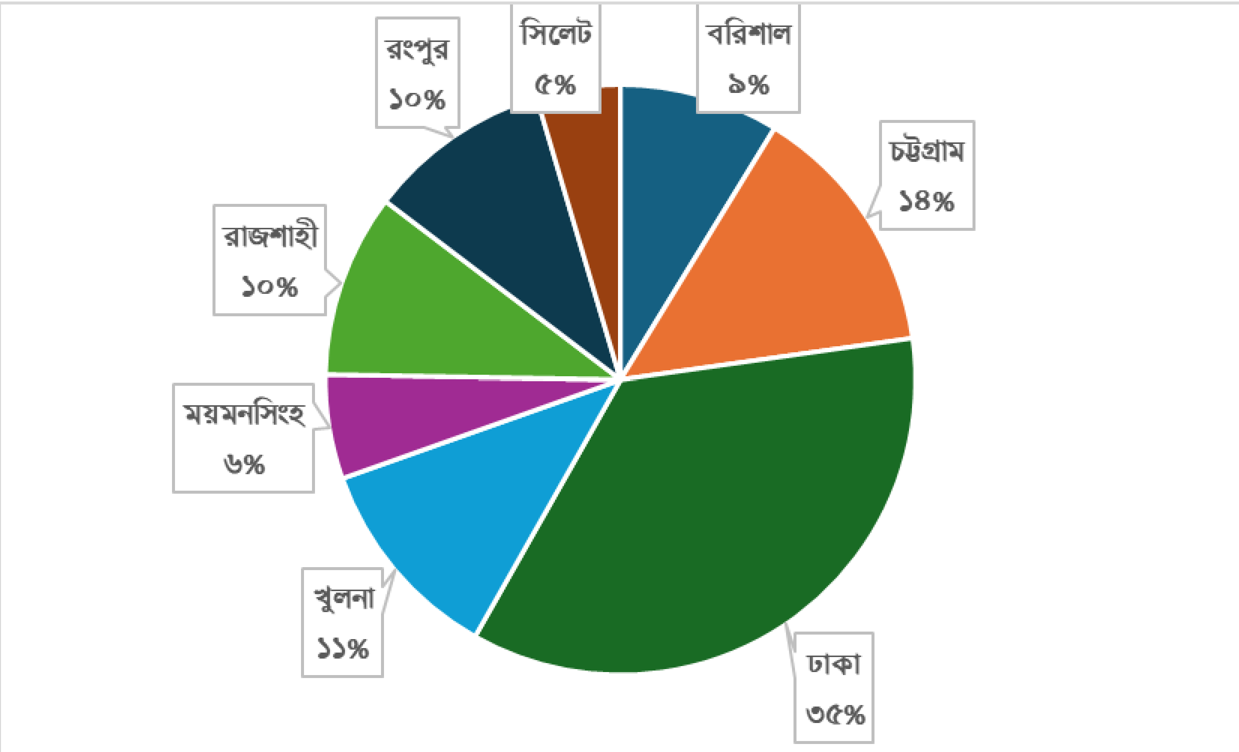

সূত্র: টিআইবিকর্তৃক গণমাধ্যম সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ (২০২৪-২০২৫)

[২০] https://www.askbd.org/ask/2025/11/10/journalist-harassment-jan-oct-2025/

গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে হামলা, নিয়ন্ত্রণ এবং অপরিবর্তনীয় আইনী কাঠামো: বাংলাদেশের গণমাধ্যম নানা কারণে কখনোই পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে নি। কর্তৃত্ববাদী সরকারের সময় গণমাধ্যমের মালিকানায় রাজনৈতিক ও কর্পোরেট স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা এবং সরকারঘনিষ্ঠ উচ্চপদস্থ সাংবাদিকগোষ্ঠীর কারণে কখনোই গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায় নি। এছাড়া নিয়ন্ত্রণমূলক নানা আইনী কাঠামোর প্রচ্ছন্ন চাপ তো ছিলোই। কিন্তু কর্তৃত্ববাদের পতনের পরও এই স্বাধীনতা কেনো ফিরে আসে নি, সেটি বড় প্রশ্ন। তবে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, আগে সরকারের একমুখী চাপ থাকলেও এখন বিভিন্ন প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল, উগ্রবাদী সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীল হুমকি, ধর্মীয় ও ব্যবসায়িক গোষ্ঠী এবং কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমলে অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচারিতার প্রভাবে এখনো গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়ে উঠে নি। বিশেষ করে, ধারাবাহিক হামলা, মামলা, সংঘবদ্ধ আক্রমনের ভয় এখনো কাটিয়ে ওঠা যায় নি।[২১] অন্তত দুটি প্রধান সংবাদপত্র এবং কয়েকটি টিভি চ্যানেল প্রতিনিয়ত সংঘবদ্ধ আক্রমনের হুমকিতে আছে। এর মধ্যে গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও ভারতসংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তুলে দৈনিক প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ের সামনে দিনের পর দিন সংঘবদ্ধ বিক্ষোভ ও অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন পত্রিকা ও টেলিভিশনের স্থানীয় কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।

এছাড়া সাধারণভাবে বর্তমান সরকার গণমাধ্যমের সংবাদ প্রচার ও প্রকাশের ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে অত্যন্ত উদার এবং উন্মুক্ত- এমনটা মনে হলেও গণমাধ্যমকর্মীদের মাঝে সরকারের বিভিন্ন অংশীজনের বক্তব্য ও সমালোচনার কারণে একধরণের ভীতি জন্ম নিয়েছে। বিশেষ করে, অন্তর্বর্তী সরকার সচিবালয়ে প্রবেশে সাংবাদিকদের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল করার বিষয়টি অনেক সাংবাদিককেই ভীত করে তুলেছে, অনেকেই পুরনো সেল্ফ সেন্সরশিপ থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না। আর সরকারের সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ থাকা কিছু রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন নেতার অব্যাহত হুমকি-ধামকি, সাংবাদিকদের প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের চাপে রাখা স্বাধীন সাংবাদিকতাকে সংকুচিত করছে।

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্তত ১৩টি আইনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসকল আইনের বিভিন্ন ধারায় অতীতের সমস্ত নিয়ন্ত্রণমূলক উপাদান বিদ্যমান থাকা এবং যেগুলো সংশোধিত বা নতুন করে প্রণয়ন করা হয়েছে, সেখানেও স্বাধীন সাংবাদিকতা বিরুদ্ধ বিভিন্ন ধারার কারণে সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করার মতো পরিবেশ এখনো তৈরি হয় নি। যেমন- বাংলাদেশ পেনাল কোডের ৪৯৯ থেকে ৫০২ ধারা, ফৌজদারি কার্যবিধি ১৯৯৮-এর ৯৯ক ও ৯৯খ ধারা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন থেকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং সর্বশেষ এর সংশোধিত রূপ সাইবার নিরাপত্তা আইনের কিছু ধারা এখনো গণমাধ্যমের স্বাধীনতা পরিপন্থী। অফিসিয়াল সিক্রেটস আইন ১৯২৩-এ সাংবাদিকতা পরিপন্থী কিছু ধারার পরিবর্তন বা সংশোধন না হওয়া, প্রেস কাউন্সিল আইন ১৯৭৪ পূর্ণরূপে কার্যকর না থাকা, আদালত অবমাননা আইন ১৯২৬ বলবৎ থাকা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত সংক্রান্ত বর্তমান আইন, জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালার কিছু ধারা, জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ২০১৭, দ্যা প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন্স আইন ১৯৭৩ সংশোধনের পরও বেশ কিছু অসঙ্গতি থাকায় গণমাধ্যমের উপর আরোপিত নিয়ন্ত্রণমূলক আইনী কাঠামো এখনো স্বাধীন সাংবাদিকতা ও সাংবাদিক সুরক্ষার জন্য বাধা হয়ে আছে। এসব বাধা দূর করে সাংবাদিকতার সুরক্ষা এবং স্বাধীন সাংবাদিকতা নিশ্চিত করতে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন বৈশ্বিক উত্তম চর্চার আলোকে বাংলাদেশেও সাংবাদিকতার স্বাধীনতা বা অধিকার সুরক্ষা আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেছে।[২২]

ভুয়া তথ্য, অপতথ্য এবং বিকৃত তথ্যের প্লাবন- গণমাধ্যমের বিপদ: কর্তৃত্ববাদের সময় ভুয়া তথ্য, অপতথ্য ও বিকৃত তথ্যের প্রচলন, প্রসার ও ছড়াছড়ি থাকলেও কর্তৃত্ববাদের পতন পরবর্তী সময়ে এসে এর প্রবণতা ও ব্যাপকতা আরো অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে, সংবাদমাধ্যমের অনলাইন পোর্টাল বা বিভিন্ন মেটা প্ল্যাটফর্মে প্রচারিত বিভিন্ন সংবাদের ফটোকার্ড নকল করে ভুয়া তথ্যের প্রচার অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে, যার ফলশ্রুতিতে সাংবাদিকদের পাশাপাশি রাজনীতিবীদরাও এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন।[২৩]

গণমাধ্যমের ছদ্মাবরণে কিংবা বিভিন্ন গণমাধ্যমের নাম কপি করে ডোমেইন কিনে অপতথ্য, গুজব ও বিকৃত ছড়াচ্ছে একাধিক পোর্টাল। যেমন আজকের কণ্ঠ, বিডি ডাইজেস্ট, দ্যা ভয়েসসহ আরো অনেকগুলো নিউজ পোর্টাল ক্রমাগত মিথ্যা

[২১] https://samsn.ifj.org/SAPFR24-25/bangladesh/

[২২] প্রাগুক্ত: ১

[২৩] https://www.globaltvbd.com/news-details/52430

তথ্য ও গুজব ছড়িয়ে যাচ্ছে।[২৪] কর্তৃত্ববাদের সময় থেকে প্রচারিত বাংলা ইনসাইডার নামে একটি অনলাইন পোর্টাল এখন গুজব ও অপতথ্য প্রচারের কারখানা হয়ে উঠেছে।[২৫] এআই ব্যবহার করে- এমনকি বিভিন্ন টেলিভিশনের আদলে মিথ্যা ও গুজব সম্বলিত ভিডিও বানিয়ে তা মেটা প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, যেটি সাধারণ চোখে সনাক্ত করাও কঠিন হয়ে পড়ছে। এছাড়া বিভিন্ন মেটা প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়া গুজব, অপতথ্য ও ভুয়া তথ্যের ভীড়ে মূলধারার গণমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হচ্ছে। যেমন, রিউমার স্ক্যানারের এক বিশ্লেষণে দেখা যায়, বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) রাজনৈতিক অপতথ্যের বিস্ফোরণ ঘটেছে। বিশেষ করে লিঙ্গভিত্তিক অপতথ্যের রাজনীতির কবলে নারীর অবস্থান আরো প্রান্তিক হচ্ছে। এই ধরণের অপতথ্য মূলধারার গণমাধ্যমকে যেমন প্রশ্নবিদ্ধ করছে, তেমনি মূলধারার গণমাধ্যম কখনো কখনো প্রতিযোগিতার পেছনে ছুটে সেগুলো প্রচার/প্রকাশ করে নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করছে। কখনো কখনো ছড়িয়ে পড়ছে।[২৬] [২৭]

গণমাধ্যমের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর দূর্বলতা: প্রাতিষ্ঠানিক এবং আর্থিক দূর্বলতা, অব্যব্যস্থাপনা ও অস্বচ্ছলতার জন্য বিভিন্ন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে পূর্ব থেকেই অনিয়মিত বেতন-ভাতা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ও পদোন্নতি না হওয়ার মতো জটিলতা ছিলো। কর্তৃত্ববাদের পতনের পর অধিকাংশ গণমাধ্যমেই এই সংকট আরো প্রকট পেয়েছে। অনেকে অভ্যুত্থানকালীন ও পরবর্তী ব্যবসায়িক মন্দাবস্থা ও ক্ষয়ক্ষতির অজুহাতে নিয়মিত বেতন-ভাতা দিচ্ছে না। আর অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি আটকে গেছে; এমনকি বার্ষিক কয়েক কোটি টাকা মুনাফা করা গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানও তার কর্মীদের বেতন বৃদ্ধিতে গড়িমসি করছে। আবার অনেক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান প্রতিনিয়ত লোকসানে থেকেও, ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষার হাতিয়া হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যার প্রভাব পড়ছে তার কর্মীদের উপর। এর বাইরে, রাজনৈতিক বিবেচনায় অনেক গণমাধ্যম নিবন্ধন পাওয়ায় শুরু থেকেই বেশ কিছু গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান বহুবছর ধরেই পর্যাপ্ত মূলধন ও সম্পদের অভাবে ভুগছে। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নীতি বিশ্লেষণ এবং দুর্নীতির অনুসন্ধানে প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ঘাটতি, যোগ্য কর্মীর অভাব, যথাযথ প্রশিক্ষণের ঘাটতি, বিজ্ঞাপনী আয় সংগ্রহে প্রতিকুলতা, উচ্চ পরিচালন ব্যয়, সাংবাদিকদের অপর্যাপ্ত মজুরী এবং সীমিত লাভের কারণে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।[২৮][২৯]

গণমাধ্যম-সংশ্লিষ্টদের রাজনৈতিক আনুগত্য: কর্তৃত্ববাদী শাসনকালে গণমাধ্যমের মালিক ও কর্তাব্যক্তিরা তৎকালীন সরকারের নিরঙ্কুশ আনুগত্য মেনে নিয়েছিলো। আশা করা হয়েছিলো যে, কর্তৃত্ববাদের পতনের পর এ অবস্থার পরিবর্তন হবে। কিন্তু অনেক গণমাধ্যমই এখন 'কেবলা বদলে' আগামীতে ক্ষমতায় আসতে পারে এমন রাজনৈতিক দলসমূহের আনুগত্য মেনে নিয়েছে। এর ফলে আগের মতোই তোষামোদী ও ফরমায়েশি সংবাদ কিংবা প্রতিবেদন প্রচার ও প্রকাশের ধারা এখনো অব্যাহত আছে। গণমাধ্যম তার কাঙ্খিত স্বাধীনতা অর্জন করতে পারছে না।

আসন্ন জাতীয় নির্বাচন এবং গণমাধ্যমকর্মীদের নিয়ন্ত্রণ: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য প্রণীত নীতিমালায় সাংবাদিক ও সাংবাদিক সংগঠনের নানা আপত্তি স্বত্ত্বেও পূর্বের ধারা বজায় রেখেছে নির্বাচন কমিশন। বিশেষ করে, ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের পর সাংবাদিক প্রিজাইডিং অফিসারকে অবহিত করে ছবি বা ভিডিও ধারন করবে; কিংবা একটি ভোট কক্ষে একবারে দুইজনের বেশি প্রবেশ করতে না পারবে না এবং প্রবেশের পর ১০মিনিটের বেশি অবস্থানের সুযোগ থাকবে না। বিষয়টি নির্বাচনী রিপোর্টিংয়ে প্রবল বাধা তৈরি করবে। এই নীতিমালা প্রতিপালন করতে গেলে সাংবাদিকদের সাথে মাঠ পর্যায়ে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের মনোমালিন্য ও বিবাদ তৈরি করতে পারে। পাশাপাশি উত্তজনাকর পরিস্থিতিতে সাংবাদিক বা কর্মকর্তার আচরণ উভয়ের জন্যই নেতিবাচক হবে। আবার কোনো ভোট কক্ষে তাৎক্ষণিক অনিয়ম বিষয়ে সংবাদ প্রচারসহ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালন বাধাগ্রস্ত হতে পারে।[৩০]

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বিষয়ে সাধারণ মানুষের ধারণা: কর্তৃত্ববাদের পতনের পর ২০২৫ সালের ১-৭ জানুয়ারি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) গণমাধ্যম বিষয়ে একটি জরিপ পরিচালনা করে। গণমাধ্যম ব্যবহার-সংক্রান্ত দেশের প্রথম এই জাতীয় পর্যায়ের জরিপে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, স্বাধীন সাংবাদিকতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে মতামত দেন জরিপে

[২৪] https://banglafact.com/search
[২৫] https://thedissent.news/digital-investigations/a-fake-news-factory-trying-to-reinvent-its-tactics
[২৬] https://rumorscanner.com/fact-file/stat-third-quarter-2025/171560
[২৭] https://rumorscanner.com/fact-file/women-disinformation-trends-2025/170427
[২৮] Aminuzzaman, Salahuddin M. and Khair, Sumaiya, Governance and Integrity: The National Integrity Systems in Bangladesh, The University | Press Limited (UPL), 2017
[২৯] প্রাগুক্ত: ১
[৩০] https://www.ecs.gov.bd/files/kWhIXkZS19Sr4j6rhJRoCC7NF4pRjbNQCHitTczW.pdf

অংশগ্রহণকারীরা। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা শীর্ষক প্রশ্নে জরিপের ফলে দেখা যায়, ১৭ দশমিক ২৯ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করছেন দেশের সংবাদমাধ্যম এখন পুরোপুরি স্বাধীন। ২৪ দশমিক ১৮ শতাংশের মতে অনেকটাই স্বাধীন। কিছুটা বা কখনো কখনো স্বাধীন বলে মনে করেন ২৩ দশমিক ৬৪ শতাংশ উত্তরদাতা। অন্যদিকে ১৫ দশমিক ৩১ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম কোনোভাবেই স্বাধীন নয়।

আবার দেশের গণমাধ্যম কেন স্বাধীন নয়? এই প্রশ্নের একাধিক উত্তরের মধ্য থেকে ৭৯ দশমিক ৪৬ শতাংশ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কথা বলেছেন। সরকারি হস্তক্ষেপের কথা বলেছেন ৭১ দশমিক ৫০ শতাংশ। আর প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপের কথা বলেছেন ৫০ দশমিক ১৪ শতাংশ। গণমাধ্যম স্বাধীন না থাকার পেছনে ৩১ দশমিক ৩৬ শতাংশ উত্তরদাতা সাংবাদিকদের ব্যক্তিস্বার্থের কথা বলেছেন। এ ছাড়া ২৪ দশমিক ১৭ শতাংশ রয়েছে মালিকের ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং ১২ দশমিক ৪৫ শতাংশ বিজ্ঞাপনদাতাদের চাপের কথা বলেছেন।

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৬৭ দশমিক ৬৭ শতাংশ গণমাধ্যমকে স্বাধীন দেখতে চান। নিরপেক্ষ বা পক্ষপাতহীন দেখতে আগ্রহী ৫৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ। এ ছাড়া ৩২ দশমিক ৬৮ শতাংশ সরকারি প্রভাবমুক্ত, ৩৭ দশমিক ৩৯ শতাংশ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, ১৭ দশমিক ২৬ শতাংশ বস্তুনিষ্ঠ, ৩০ দশমিক ৫৭ শতাংশ সাধারণ নাগরিকদের চাহিদা পূরণে সক্ষম, ১৬ দশমিক ১৬ শতাংশ হলুদ সাংবাদিকতামুক্ত, ৯ দশমিক ৩১ শতাংশ ব্যবসায়িক প্রভাবমুক্ত, ৯ দশমিক ৫৮ শতাংশ আর্থিক প্রভাবমুক্ত গণমাধ্যম দেখতে চান বলে মত দিয়েছেন।[৩১]

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন: সম্ভাবনা ও বাস্তবতা

২০২৪ সালের ১৮ নভেম্বর অন্তর্বর্তী সরকার গণমাধ্যমের সংস্কারের লক্ষে যে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন গঠন করে, দীর্ঘ পাঁচ মাস বিভিন্ন অংশীজনদের সাথে আলাপ-আলোচনা শেষে ২০২৫ সালের মার্চে এই কমিশন অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন হস্তান্তর করেন। সেখানে গণমাধ্যমের ভূত-ভবিষ্যত আলোচনাসহ একগুচ্ছ সুপারিশ প্রদান করে সংস্কার কমিশন। সে সময় আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলো দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়নের কথা বলা হলেও দীর্ঘ প্রায় ৯ মাসে একটি সুপারিশও বাস্তবায়ন করা হয় নি।

বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন: প্রেস কাউন্সিল ও প্রস্তাবিত সম্প্রচার কমিশনের পরিবর্তে বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন নামে স্বাধীন একটি কমিশন গঠন করার সুপারিশ করেছিলো গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন। কিন্তু সেই সুপারিশ আমলে নেয় নি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। যদিও বিষয়টি একদম বাতিল করা হয় নি বলে দাবি করেছে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্র।[৩২]

সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষা অধ্যাদেশ: সাংবাদিকদের অধিকার সুরক্ষায় নতুন একটি অধ্যাদেশের খসড়া করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। তবে এ বিষয়ে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত খসড়ার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের তৈরি করা প্রাথমিক খসড়ায় রাখা হয়নি। তাই গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কামাল আহমেদ মনে করেন, সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষা অধ্যাদেশে তথ্য মন্ত্রণালয় যেভাবে সংশোধনী আনতে চাইছে, তাতে সংস্কারের মূল লক্ষ্য অর্জিত হবে না। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রণীত খসড়াটি সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষায় একটি 'সুরক্ষাবলয়' তৈরি করতে পারত। কিন্তু মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু ধারা বাদ দেওয়ায় মূল উদ্দেশ্য অনেকটাই দুর্বল হয়ে গেছে।[৩৩]

তথ্য মন্ত্রণালয়ের করা খসড়ার– ৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক সাংবাদিক বা সংবাদকর্মীকে সহিংসতা, হুমকি ও হয়রানি থেকে সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা সরকারের। তবে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত দুটি উপধারা এখানে বাদ গেছে। এর মধ্যে একটির মূল কথা ছিল, কোনো ব্যক্তি এমন কিছু করবেন না, যাতে সাংবাদিকের ব্যক্তিগত বা পেশাগত জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হয়। অন্যটিতে বলা হয়েছিল, সাংবাদিকদের পেশাগত নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সরকার উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে।

৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, গৃহ, পরিবার ও যোগাযোগের সব মাধ্যম সুরক্ষিত রাখার অধিকার থাকবে এবং সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু কমিশনের খসড়ায় থাকা দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপধারা মন্ত্রণালয় বাদ দিয়েছে। সেগুলোয় বলা ছিল, এক- পেশাগত কাজে নিয়োজিত সাংবাদিকের জীবন, স্বাধীনতা ও গোপনীয়তা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা যাবে না এবং বল প্রয়োগ করে অবৈধভাবে তাঁর গৃহে প্রবেশ, তল্লাশি বা সম্পদ জব্দ

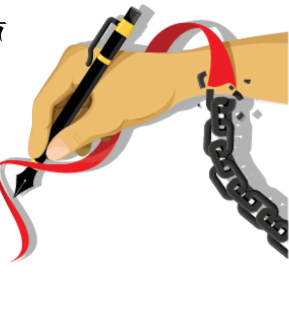

[৩১] প্রাগুক্ত: ১

[৩২] https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-709691

[৩৩] https://www.prothomalo.com/bangladesh/q2u7rtvswd

করা যাবে না। দুই- আইন অনুযায়ী ব্যতীত এমন কোনো ব্যবস্থা করা যাবে না, যা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার, স্বাধীনতা, সুনাম সম্মান বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

৫ নম্বর ধারার প্রথম উপধারায় কমিশন বলেছিল, সাংবাদিক যেন কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ, কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারি কর্মচারী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভয়ভীতি বা জোরপূর্বক শারীরিক বা মানসিক চাপমুক্ত অবস্থায় স্বাধীনভাবে এবং অনুকূল পরিবেশে দায়িত্ব পালন করতে পারেন, সেটি সরকার নিশ্চিত করবে। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের খসড়ায় এই উপধারাও বাদ দেওয়া হয়েছে।

কমিশনের খসড়ার ৭ নম্বর ধারায় ছিল, যদি কোনো সাংবাদিক সরল বিশ্বাসে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন এবং তাতে কারও ক্ষতি হয়, তবে ভিন্ন উদ্দেশ্য প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না। এই পুরো ধারা তথ্য মন্ত্রণালয়ের খসড়ায় বাদ দিয়েছে।

কমিশনের ১০ নম্বর ধারায় ছিল, আদালত ধারা ৯-এর অধীন আরোপিত অর্থদণ্ডকে সাংবাদিকের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে গণ্য করতে পারবেন এবং অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণের অর্থ দণ্ডিত ব্যক্তির কাছ থেকে আদায়যোগ্য হবে। এই ধারাও মন্ত্রণালয় বাদ দিয়েছে। কমিশনের খসড়ায় বলা ছিল, অধ্যাদেশের অধীন দায়ের করা অভিযোগ ও মামলা সহকারী পুলিশ সুপারের নিচে নন, এমন কর্মকর্তা দ্বারা তদন্ত হবে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত খসড়ায় এই উপধারাও রাখা হয়নি।

সংস্কার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকারের আরো উদ্যোগ: গত জুলাইয়ে (২০২৫) সংস্কার কমিশনের সুপারিশের আলোকে বেশ কিছু সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। সেগুলো হলো– সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষা-সংক্রান্ত অধ্যাদেশ প্রণয়ন; পত্রিকার প্রচারসংখ্যা নিরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কারে টাস্কফোর্স গঠন; পত্রিকার বিজ্ঞাপন হার যৌক্তিক পর্যায়ে বৃদ্ধি; শ্রোতা, দর্শক ও পাঠকের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি যাচাইয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে বার্ষিক জরিপ; বিজ্ঞাপন শিল্পে অনৈতিক যোগসাজশ বন্ধে প্রতিযোগিতা কমিশনের সঙ্গে আলোচনা; এফএম রেডিও লাইসেন্সের জামানত ফি কমানো; বিজ্ঞাপন থেকে আয়ের ২ শতাংশ সরকারি ফি বাতিল; বিনামূল্যে সরকারি ঘোষণা প্রচারের বাধ্যবাধকতা; কলাম লেখক, শিল্পী, টক শোর অতিথিদের সম্মানীর ওপর অগ্রিম কর রহিত করা; এবং আপ-লিংক ও ডাউন-লিংকে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানী লিমিটেড (বিএসসিএল) ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা তুলে নেওয়া।

উল্টো পথে যাত্রা: গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের একটি পর্যবেক্ষণ ছিলো, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায় (বাসস) লোকবলের চাহিদা ৬৫ জন, কিন্তু সেখানে রাজনৈতিক স্বার্থে ৯৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল; প্রায় এক তৃতীয়াংশ জনবল উদ্বৃত্ত ছিলো। অথচ অন্তবর্তী সরকারের আমলে সেখানে আরও ৪৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়।

গণমাধ্যমের পরিস্থিতি উন্নয়ন ও স্বাধীনতা নিশ্চিতে টিআইবির সুপারিশ:

১. গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সকল সুপারিশ অনতিবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে;
২. কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষা অধ্যাদেশ করতে হবে;
৩. কমিশনের সুপারিশ মেনে প্রেস কাউন্সিল বিলুপ্ত করে স্বাধীন জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন গঠন করতে হবে;
৪. রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সকল গণমাধ্যমকে জাতীয় বা বাংলাদেশ সম্প্রচার সংস্থা গঠন করে, পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দিতে হবে;
৫. সাংবাদিকদের আর্থিক নিরাপত্তা ও শ্রম আইন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী করতে হবে; নিয়মিত বেতন-ভাতা দেওয়ার পাশাপাশি চাকুরির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে।
৬. কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মাঝারি ও বৃহৎ গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত করে সকলের জন্য শেয়ার ওপেন করে দিতে হবে। আর ছোট আকারের প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের শেয়ার প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে;
৭. ভুয়া ও অপতথ্য মোকাবিলায় প্রতিটি গণমাধ্যমের নিউজরুমে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে। প্রয়োজনে ফ্যাক্ট চেকার পদে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ একাধিক কর্মী নিয়োগ দিতে হবে;
৮. প্রতিনিয়ত ভুয়া ও অপতথ্য, গুজব ও মিথ্যা সংবাদ প্রচারকারী সকল গণমাধ্যমকে (অনলাইন পোর্টাল ও মেটার সকল প্ল্যাটফর্মে) প্রাথমিকভাবে সতর্কতা ও জরিমানাসহ লঘু দণ্ডের পরও অপরাধের পুনরাবৃত্তি করলে

কিংবা মালিকপক্ষ অপ্রকাশিত থাকলে সেগুলো বন্ধ করে দিয়ে মালিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৯. ফটোকার্ড তৈরি ও প্রচারের নির্দিষ্ট মানদণ্ড তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সংবাদ সম্বলিত ফটোকার্ডগুলোতে কিউআর কোড সিস্টেম বা যেকোনো পরিচয়সূচক চিহ্ন রাখতে হবে, যাতে সহজেই যাচাই করা যায়;

১০. গণমাধ্যমকে নারী, আদিবাসী, সংখ্যালঘু বিষয়ে অন্তর্ভূক্তিমূলক হতে হবে এবং পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করা যাবে না;

১১. সকল প্রকার ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক উষ্কানি এবং যে কোনো ধরণের সন্ত্রাসী হামলা-আঘাত থেকে সকল গণমাধ্যমকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সুরক্ষা প্রদান করতে হবে;

১২. সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করে, স্বাধীন সাংবাদিকতার পথ সুগম করতে হবে।

****

জাফর সাদিক

ডেপুটি কোঅর্ডিনেটর, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, টিআইবি।